সংবিধান, রাষ্ট্র ও সরকার
(Constitution, State and Government)

ইউনিট-৬

রাষ্ট্র একটি চিরন্তন, স্থায়ী এবং সর্বোচ্চ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক অবস্থা থেকে বর্তমান পর্যায়ে উত্তরণের জন্য রাষ্ট্রকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে বিকাশ ঘটাতে হয়েছে। বর্তমান সভ্য জগতে রাষ্ট্র মানব সমাজের অপরিহার্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের মৌলিক আইন ও পবিত্র দলিল। সংবিধানের মাধ্যমেই রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালিত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অঙ্গ হচেছ সরকার। সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সরকারের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয়ে থাকে। সংবিধানের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। তাই সংবিধানকে রাষ্ট্রের দর্পণ বলা হয়।

আসুন এবারে আমরা সংবিধান, রাষ্ট্র ও সরকার শীর্ষক ইউনিটের পাঠের বিষয়কে নিম্নে উলি- খিত ৫টি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করি:

- *পাঠ-১ সংবিধানের সংজ্ঞা ও উত্তম সংবিধান*
- *পাঠ-২ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী*
- *পাঠ-৩ সরকারের শ্রেণী বিভাগ*
- *পাঠ-৪ জাতীয় সংহতি*
- *পাঠ-৫ বিপ্লব ও সংস্কার*

পাঠ-১

সংবিধান
Constitution

উদ্দেশ

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সংবিধানের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারবেন।
- সংবিধান কত প্রকার তা বলতে পারবেন।
- উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

সংবিধানের সংজ্ঞা:

যে কোন ধরনের সরকারের উৎস হচ্ছে সংবিধান। গণতান্ত্রিক হোক আর সমাজতান্ত্রিক হোক কিংবা রাজতান্ত্রিক হোক-সকল সরকারের নিজস্ব সংবিধান রয়েছে। কোন রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতি কিরূপ তা জানা যায় সংবিধান থেকে। সংবিধানকে রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি বলা হয়। প্রত্যেক সংবিধানই সমসাময়িক কালে সমাজে বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতি এবং প্রচলিত বিশ্বাসের ফল স্বরূপ। হাল ছাড়া যেমন নৌকা চলে না, তেমনি সংবিধান ছাড়া রাষ্ট্রযন্ত্র অচল হয়ে পড়ে । সংবিধান হচ্ছে জাতির পবিত্রতম দলিল। সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের মৌলিক আইন। সংবিধান সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে থাকে। এটা সরকারের বিভিন্ন-বিভাগ, আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে থাকে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটল থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সংবিধানের সংজ্ঞা দিয়েছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটলের মতে- 'Constitution is the way of life the state has chosen for itself' অর্থাৎ কোন রাষ্ট্র নিজেকে পরিচালনার জন্য যে পথ বেছে নেয় তাই সংবিধান।

অধ্যাপক ফাইনার বলেন, 'The system of fundamental political institutions is the constitution' রাষ্ট্রের মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পরস্পরের সমন্ধ হলো সংবিধান। ফাইনারের মতে মানুষ জীবনের অনিশ্চয়তাগুলোকে দূর করে নিরাপত্তা চায়, সংবিধান এই নিরাপত্তা দান করে।

কে.সি হুইয়ার বলেন, 'That body of rules which regulates the ends for which and of the organs through which Governmental power is exercised is called a constitution' সংবিধান হচ্ছে সেই বিধানসমূহ যার দ্বারা কি উদ্দেশ্যে এবং কোন বিভাগের মাধ্যমে সরকারি ক্ষমতা পরিচালিত হবে তা নির্ধারণ করে।

সি.এফ.ষ্ট্রং সংবিধানের সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন, তিনি বলেন, 'সংবিধান হচ্ছে সেই সকল নিয়মের সমষ্টি যা সরকারের ক্ষমতা, শাসিতের অধিকার এবং এ দু'য়ের সম্পর্ক নির্ধারণ করে।

উলসের ভাষায় 'শাসন্ত্র হচ্ছে কতকগুলো মৌলিক বিধানের সমষ্টি যা দ্বারা সরকারের ক্ষমতা ও শাসিতের অধিকার নির্ধারিত হয়।'

কার্ল জে ফ্রেডরিক 'Constitution at Govt. and Democracy' গ্রন্থে সংবিধানকে Rules of game এর সাথে তুলনা করেছেন। জঁষবং ড়ভ মধসব দ্বারা যেমন খেলাধূলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। তেমনি শাসনতন্ত্রের দ্বারা সরকার সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়। এ সকল সংজ্ঞা থেকে সংবিধানের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা যায়।

অতএব সংবিধান বলতে রাষ্ট্র, সরকার এবং সরকরের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ক্ষমতাবন্টন এবং শাসক শাসিতের অধিকার, দায়িত্ব ও পরিচালনা সম্বলিত কতকগুলো মৌলিক নীতিমালার সমষ্টিকে বুঝায়।

সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ

প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী সংবিধান সাধারণত দু'ধরনের হয়ে থাকে (ক) লিখিত সংবিধান ও (খ) অলিখিত সংবিধান।

লিখিত সংবিধান: লিখিত সংবিধান সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট এটা সজ্ঞান প্রচেষ্টার ফল। লিখিত সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায় না। এটি অনমনীয় বা দুস্পরিবর্তনীয়। যেমন মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের ও বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত সংবিধানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অলিখিত সংবিধান: ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল হল অলিখিত সংবিধান। এটি অস্পষ্ট এবং অনেক ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট নয়। অলিখিত সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায়, এটি সুপরিবর্তনীয় বা নমনীয়। ব্রিটেন বিশ্বের মধ্যে অলিখিত শাসনতন্ত্র নিয়ে মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। তবে এ কথা আজ স্বীকৃত যে বর্তমান জগতে কোন শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণভাবে লিখিত কিংবা অলিখিত নয়।

লর্ড ব্রাইস সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির ভিত্তিতে সংবিধানকে সুপরিবর্তনীয় ও দুস্পরিবর্তনিয়-এ দু'ভাগে ভাগ করেছেন। সুপরিবর্তনীয় সংবিধান পরিবর্তন করতে হলে কোন জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় না। পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপখাওয়ানোর জন্যে এটি সহজেই পরিবর্তন করা যায়। এটা রাজনৈতিক জীবনের গতির সঙ্গে তালমিলিয়ে চলতে পারে।

দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধান সুস্পষ্ট, সুদৃঢ়, স্থিতিশীল ও সুনির্দিষ্ট। এটি সহজেই পরিবর্তন করা যায় না বলে নিশ্চয়তার প্রতীক। এটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার জন্য অধিকতর উপযোগী।

উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ

সংবিধানে কতকগুলো উলে-খযোগ্য বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকলে সেই সংবিধানকে উত্তম বা আদর্শ সংবিধান বলা যায়। যে সকল গুণাবলী বা আদর্শ থাকলে একটি সংবিধানকে উত্তম সংবিধান বলা যায়, তা নিম্নে আলোচনা করা হল:

প্রথমত: উত্তম সংবিধান সুস্পষ্ট, যুক্তিভিত্তিক ও আদর্শ ভিত্তিক হবে।

দ্বিতীয়ত: সংবিধানকে যুগের সাথে মানুষের মন-মানসিকতার সাথে তালমিলিয়ে চলতে হবে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিবর্তনের সাথে সাথে উত্তম শাসনতন্ত্রও এগিয়ে চলে।

তৃতীয়ত: একটি উত্তম সংবিধানে লিখিত এবং অলিখিত সুপরিবর্তনীয় এবং দুস্পরিবর্তনীয় উপাদান থাকতে হবে।

চতুর্থত: উত্তম সংবিধানের নাগরিকের মৌলিক মানবিক অধিকার সন্নিবেশিত থাকবে। যেমন সম্পত্তি রক্ষা, জীবন রক্ষা, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা ইত্যাদি।

সংবিধানের নাগরিকের মৌলিক মানবিক অধিকার সন্নিবেশিত থাকবে

পঞ্চমত: অল্পকথায় সংবিধান ভালভাবে লিখিত থাকবে। শাসনতন্ত্রের ভাষা হবে প্রাঞ্জল, সাবলীল ও সুন্দর। উদাহরণস্বরূপ আমেরিকার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের) বিশপৃষ্ঠা ব্যাপী সংবিধান বিশ্বের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান।

ষষ্ঠত: শাসনতান্ত্রিক প্রাধান্য থাকতে হবে। শাসনতন্ত্র সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ও সার্বভৌম।

সপ্তমত: শাসনতান্ত্রিক প্রাধান্যকে রক্ষা করার জন্যে বিচার বিভাগীয় প্রাধান্য থাকতে হবে।

উত্তম শাসনতন্ত্র প্রসঙ্গে ফাইনারের বক্তব্য হচ্ছে 'সংবিধানে এমন কিছু থাকবে না যা কখনও কোন উপায়ে পরিবর্তন করা যাবে না, আবার সংবিধানে এমন কিছু থাকবে না যা সব সময় পরিবর্তন করা যাবে-এটা উত্তম সংবিধানের লক্ষণ।' উল্লেখ্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের তিনশ' বছরের ইতিহাসে মাত্র ৩৩টি বিধি সংশোধন করা হয়েছে।

কে.সি.হুয়ার বলেন, 'One essential characteristics of the ideally best form of constitution is that it should be as short as possible'। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এফ.উইলোবির মতে 'Rigidity and flexibility are the two opposing tendencies of a good constitution'। উত্তম সংবিধান প্রণয়ন অবশ্যই একটি সহজ সংশোধন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। আদর্শ সংবিধান হবে সামাজিক ঐতিহ্য ও আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি।

সরকথা: সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল। আইনসভা শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ, নির্বাচকমন্ডলী এবং শাসক-শাসিতের মধ্যকার ক্ষমতাগত সম্পর্কের নির্দেশনা থাকে সংবিধানে। যে সকল মৌলিক নীতিমালা রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও পদ্ধতি নির্ণয় করে তাকে সংবিধান বলে। সংবিধান রাষ্ট্রের দর্পণ বা আয়নাস্বরূপ। যে দেশ বা জাতির সংবিধান যত উন্নত আদর্শের অনুসারী সে জাতি তত উন্নত। একটি উত্তম সংবিধান অবশ্যই সুপরিবর্তনীয় ও দুস্পরিবর্তনীয়। তবে একথা সত্য কোন সংবিধানই সম্পূর্ণ লিখিত বা অলিখিত কিংবা সুপরিবর্তনীয় বা দুস্পরিবর্তনীয় নয়।

পঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. সংবিধান বা শাসনতন্ত্র হচ্ছে-
ক. রাষ্ট্রের সাধারণ আইন
খ. রাষ্ট্রের মৌলিক আইন
গ. রাষ্ট্রের বিশেষ আইন
ঘ. আন্ড়র্জাতিক আইন।

২. সরকার পরিচালিত হয়-
ক. শাসনতন্ত্রের দ্বারা
খ. সাধারণ আইনের দ্বারা
গ. স্পেশাল আইনের দ্বারা
ঘ জরুরি আইনের দ্বারা।

৩. Constitution at Government and Democracy গ্রন্থের লেখক কে ?
ক. এরিস্টটল
খ. ফাইনার
গ. কেসি হুইয়ার
ঘ. কার্ল জে ফ্রেডরিক।

৪. অলিখিত সংবিধান হচ্ছে-
ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের
খ. যুক্তরাষ্ট্রের
গ. ভারতের
ঘ. বাংলাদেশের।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. সংবিধান কি?
২. উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।

উত্তরমালাঃ ১. খ, ২. ক, ৩. ঘ, ৪. খ।

সহায়ক গ্রন্থঃ

১. K.C: Wheare- Modern Constitution
২. A.V.: Dicey In Introduction to the Law of the constitution
৩. Finer: Theory and practice of Modern Government.

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

পাঠ-২

Aims and Functions of the State

উদ্দেশ্য:

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- আধুনিক রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে অনেক মতভেদ রয়েছে। কোন কোন মতবাদে রাষ্ট্রকে ঐশ্বরিক ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ আবার কোন কোন মতবাদে সমাজ জীবনের মহত্তম সংস্থা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আবার মতবাদে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত অস্বীকার করা হয়েছে এ ধরনের মতবাদও আছে। প্রাচীন গ্রীক আমল থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদগণ প্রায় আড়াই হাজার বছর এ বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্ক করে আসছেন। কিন্তু কোন ঐক্যমতে পৌঁছতে পারেননি।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও এরিস্টটল রাষ্ট্রকে শ্রেষ্ঠ মানবিক সংগঠন বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে রাষ্ট্রের মধ্যে নাগরিকের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। এরিস্টটল উল্লেখ করেন, রাষ্ট্রের বাইরে যারা বসবাস করেন তারা সাধারণ মানুষ নহে। হয় তারা দেবতা, না হয় পশু। মানব জীবনের প্রয়োজনেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। মানুষের কল্যাণ সাধনের উপরই এর সার্থকতা নির্ভর করে। মানব জীবনের সামাজিক, নৈতিকও আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করে রাষ্ট্রের মধ্যেই বাস্তব হয়ে ওঠে।

মানব জীবনের প্রয়োজনেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে

মধ্যযুগের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ টমাস একুইনাস এরিস্টটলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মানুষের কল্যাণ সাধনকে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করেছেন। পবিত্র ইসলাম ধর্মে রাষ্ট্র বিশ্বাসীগণের ইহলোকি ও পারলৌকিক মঙ্গলের উপায় হিসেবে গৃহীত হয়েছে। ঐক্য, শান্তি ও সৎ জীবনের প্রতীকরূপী ইসলামী রাষ্ট্র বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অ্যাডাম স্মীথ তার বিখ্যাত Wealth of Nations গ্রন্থে রাষ্ট্রের তিনটি প্রধান কাজের কথা বলেছেন। যথাঃ

১. অন্য রাষ্ট্রের আক্রমণ হতে স্বীয় রাষ্ট্রকে রক্ষা করা।
২. রাষ্ট্রের কোন সদস্যের অবিচার থেকে সকলকে রক্ষা করা।
৩. রাষ্ট্র যাতে কতিপয় ব্যক্তির স্বার্থে কার্যসম্পাদন না করে তার প্রতি সজাগ সৃষ্টি রাখা।

অধ্যাপক গার্নার রাষ্ট্রের তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন।

প্রতমত: রাষ্ট্র ব্যক্তিসমূহের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করবে। সুবিচার ও আইনের শাসনের মাধ্যমে প্রত্যেকের অধিকার রক্ষা করবে

দ্বিতীয়ত: রাষ্ট্রের উচিত হবে ব্যক্তি সমষ্টির কল্যাণ সাধন করা।

তৃতীয়ত: রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শান্তি সাহায্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্ব সভ্যতার বিকাশ ও সংরক্ষণ করবে। রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বার্জেস তাৎপর্যপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন। তার মতে, রাষ্ট্রের চরম ও পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন করে মানব সমাজে ন্যায়নীতি কায়েম করা।

দ্বিতীয়ত: রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটিয়ে জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা।

তৃতীয়ত: নাগরিকতাবোধ ও ব্যক্তি স্বাধীনতার বিকাশ সাধন করে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সঙ্গে সুসামঞ্জস্য বিধান করা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতামত বিশ্লেষণ করলে আধুনিক রাষ্ট্রের চারটি উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে। যথা-

১. রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করা।
২. জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতিসাধন এবং বিশ্বশান্তি ও বিশ্বসভ্যতার বিকাশে সহযোগিতা করা।
৩. রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

৪. নাগরিকবৃন্দের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ সাধন।

মানব সমাজের কল্যাণ সাধনই রাষ্ট্রের লক্ষ্য।

মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদার তাগিদে ক্রমবিকাশের মধ্যদিয়ে গড়ে উঠেছে রাষ্ট্রব্যবস্থা। মানব সমাজের প্রয়োজনের তাগিদেই রাষ্ট্রকে নানাবিধ কার্য সম্পাদন করতে হয়। রাষ্ট্রের কার্যাবলী কোন নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে আবর্তিত হয় না। মানব সমাজের কল্যাণ সাধনই রাষ্ট্রের লক্ষ্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উইলোবি ও গেটেল আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা-১. অপরিহার্য বা মুখ্য কার্যাবলী ২. ঐচ্ছিক বা গৌন কার্যাবলী।

অপরিহার্য কার্যাবলী: রাষ্ট্রের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণের জন্যে রাষ্ট্রকে যে সকল কাজ সম্পাদন করে তাকে অপরিহার্য কাজ বলে। রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্যগুলি নিম্নরূপ:

অভ্যন্ড়রীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ড় কার্যাবলী: জান-মালের নিরাপত্তা, রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও সংহতির জন্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্ব।

দেশ রক্ষা: দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বহি:শত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্যে স্থল বাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান বাহিনী গঠন ও তত্ত্বাবধান রাষ্ট্রের অপরিহার্য কর্তব্য।

প্রশাসনিক কার্যাবলী: সরকারী কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রকে প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণ ও কর্মচারী নিয়োগ করতে হয়।

অর্থনৈতিক ও মুদ্রানীতি সংক্রান্ত কার্যাবলী: দেশের উন্নয়ন এবং সরকারি কর্মচারীদের বেতনাদির জন্য রাষ্ট্র কর ও শুল্ক ধার্য ও আদায়ের ব্যবস্থা করে থাকে, মুদ্রানীতি সংক্রান্ত কাজ রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ বলে গণ্য হয়।

বৈদেশিক কার্যাবলী: বৈদেশিক বাণিজ্য 'সামরিক চুক্তি' শান্তি ও ও সহযোগিতা চুক্তি, কূটনৈতিক সম্পর্ক, আঞ্চলিক জোট গঠন প্রভৃতি বৈদেশিক কাজ রাষ্ট্র করে থাকে।

আইন ও বিচার সংক্রান্ত কাজ: আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, আদালত গঠন ও পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং অপরাধীদের শাস্তি প্রদান রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ বলে গণ্য হয়।
ঐচ্ছিক কার্যাবলী: নাগরিক জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্যে রাষ্ট্র স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বহু জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদন করে থাকে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে নাগরিকের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য যে সমস্ত কাজ রাষ্ট্র করে সেগুলোকে ঐচ্ছিক কার্যালী হয়।

ঐচ্ছিক কার্যাবলী নিম্নরূপ:

শিক্ষা বিষয়ক কার্যাবলী: জাতিকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা এবং নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্যে রাষ্ট্র শিক্ষা সংক্রান্ত বহুবিধ কাজ করে। যেমন-স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করে থাকে।

শিল্প-বাণিজ্য: বর্তমান বিশ্বে সকল রাষ্ট্রই শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিকাশের জন্যে, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্র শিল্প-কারখানা স্থাপন, ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য পুঁজি বিনিয়োগ সংগঠনগুলো পরিচালনা করে।

সুস্থ্য সবল জনগণ রাষ্ট্রের সম্পদ।

জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ: সুস্থ্য, সবল জনগণ রাষ্ট্রের সম্পদ। জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য রাষ্ট্র হাসপাতাল, শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে, চিকিৎসা কেন্দ্রে, মাতৃসদন ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করে থাকে। পানীয় জলের সুব্যস্থার জন্য নলকূপ খনন এবং পরিষ্কার-পরিছন্নতা অভিযান পরিচালনা করে। ম্যালেরিয়া ও বসন্ত উচ্ছেদ অভিযান এবং কলেরা ও অন্যান্য ব্যাধির প্রতিষেধক টিকা ইনজেকশন দেয়ার ব্যবস্থা করে।

যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ দেশের যোগাযোগ, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির জন্য রাষ্ট্র সড়ক, রেল পথ, বিমান, নৌপথ, ডাক, তার ও টেলিফোনের ব্যবস্থা করে। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

শ্রমিকদের কল্যাণমূলক কাজঃ রাষ্ট্র শ্রমিকদের কার্যের মেয়াদ, সময়, মজুরী নির্ধারণ, মজুরী বোর্ড ও শ্রম আদালত স্থাপন করে। দরিদ্র-শ্রমিক ও জনসাধারণের লেখা-পাড়ার জন্য রাষ্ট্র বিভিন্ন কার্যক্রমগ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করা যায়।

সামাজিক নিরাপত্তা ও জনহিতকর কার্যাবলীঃ জনসাধারণের কল্যাণের জন্যে রাষ্ট্র পেনশন, কল্যাণভাতা, যৌথবীমা, বয়স্কভাতা, বেকারভাতা ইত্যাদি পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। কৃষি, সেচব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে থাকে। এছাড়া দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। রাষ্ট্রের স্বেচ্ছামূলক কার্যের আওতা অতি ব্যাপক। বর্তমানে কোন রাষ্ট্রই আর পুলিশী রাষ্ট্র নয়। তাই রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কার্যাবলীর গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারকথাঃ

মানুষ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করে রাষ্ট্রের মধ্যে। রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেষ্ঠ নাগরিক সংগঠন। মানব সমাজের কল্যাণ সাধনই রাষ্ট্রের লক্ষ্য। রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-অপরিহার্য কার্যাবলী ও ঐচ্ছিক কার্যাবলী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. অধ্যাপক গার্নার রাষ্ট্রের ক'টি উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন ?

ক. ২টি

খ. ৩টি

গ. ৪টি।

২. অ্যাডাম স্মীথ 'Wealth of Nations' গ্রন্থটি কোন শতাব্দীতে লিখেছেন ?

১. সপ্তদশ শতাব্দীতে

খ. ষোড়শ শতাব্দীতে

গ. অষ্টাদশ শতাব্দী

ঘ. উনবিংশ শতাব্দী।

৩. রাষ্ট্রের বাইরে যাঁরা বসবাস করে তারা 'হয় দেবতা না হয় পশু'। এ উক্তিটি করেছেন -

ক. সক্রেটিস

খ. পে- টো

গ. এরিস্টটল

ঘ. গার্নার।

৪. রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উইলোরি ও গেটেল কোন রাষ্ট্রের কার্যাবলী দু'ভাগে ভাগ করেছেন ?

ক. নগর রাষ্ট্রের

খ. ইসলামিক রাষ্ট্রের

গ. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের

ঘ. আধুনিক রাষ্ট্রের।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১. অধ্যাপক গার্নারের মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যগুলো কি?

২. আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যগুলো কি ?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. রাষ্ট্রের অপরিহার্য ও ঐচ্ছিক কার্যাবলী আলোচনা করুন।

উত্তরমালাঃ ১. খ, ২. গ, ৩. গ ও ৪. ঘ।

সহায়ক গ্রন্থঃ

R.G. Gettell, Political Science (Boston: Ginn & Co. 1910)

সরকারের শ্রেণীবিভাগ
Classification of Government

পাঠ-৩

উদ্দেশ্য:

এ পাঠ শেষে আপনি-

- এরিস্টটল কর্তৃক সরকারের শ্রেণীবিভাগ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- আধুনিক সরকারের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করতে পারবেন।

সরকারের শ্রেণীবিভাগ

প্রাচীনকাল থেকে আধুনিকাল পর্যন্ড় যুগে যুগে বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। যে সমস্ত রাষ্টবিজ্ঞানী সরকারের আদি রূপ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন তাদের মধ্যে হেরোডোটাস, সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটলের নাম বিশেষভাবে উলে-খযোগ্য। তবে প্রাচীনকালের শ্রেণীবিভাগের মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগটি তাৎপর্যমন্ডিত। সক্রেটিস ও প্লেটোর অনুকরণে এরিস্টটল সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন।

গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল দু'টি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। প্রথমটি হল সংখ্যানীতি এবং দ্বিতীয়টি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যনীতি। সংখ্যানীতির ভিত্তিতে সরকারকে তিনি তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন যেমন-

১. একজনের শাসন ২. কয়েকজনের শাসন ৩. বহুজনের শাসন। উদ্দেশ্যনীতির ভিত্তিতে সরকারকে দু'টিভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন ১. স্বাভাবিক ২. বিকৃত

এরিস্টটল কর্তৃক সরকারের শ্রেণীবিভাগের

ছক:

সংখ্যানীতি	সরকার	উদ্দেশ্যনীতি
	সরকারের স্বাভাবিকরূপ	সরকারের বিকৃতরূপ
একজনের শাসন	রাজতন্ত্র	স্বৈরতন্ত্র
কয়েকজনের শাসন	অভিজাততন্ত্র	ধনিকতন্ত্র
বহুজনের শাসন	পলিটি	গণতন্ত্র

নীতি অনুযায়ী উপরি উক্ত ছক থেকে বুঝা যায় যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা যখন একজনের হাতে থাকে এবং শাসক যখন সকলের কল্যাণে সে ক্ষমতা পরিচালনা করেন তখন তাকে রাজতন্ত্র বলে। শাসন ক্ষমতা যখন কয়েক জনের হাতে থাকে এবং সে ক্ষমতা জনগণের স্বার্থে পরিচালনা করা হয় তখন তাকে বলা হয় অভিজাততন্ত্র। আবার শাসন ক্ষমতা যখন বহুজনের হাতে থাকে এবং তা যখন সকলের কল্যাণে পরিচালিত হয় তখন তাকে পলিটি বলা হয়। এরিস্টটলের মতে পলিটি হল উত্তম সরকার। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শাসন ব্যবস্থাকে তিনি পলিটি বলে বর্ণনা করেছেন ও উদ্দেশ্য নীতি অনুযায়ী জনসাধারণের উন্নয়ন কল্যাণে সরকার পরিচালিত হলে এরিস্টটল তাকে সরকারের স্বাভাবিক রূপ বলেছেন। কিন্তু সরকার জনসাধারণের কল্যাণকে উপেক্ষা করে ব্যক্তিস্বার্থ, দলীয় স্বার্থ বা গোষ্ঠী স্বার্থে পরিচালিত হলে তাকে তিনি সরকারের বিকৃত রূপ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এরিস্টটলের মতে পলিটি হল উত্তম সরকার

এরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ আধুনিক যুগে অচল। তিনি রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারেননি। বর্তমান যুগে সরকারের রূপ ও প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এরিস্টটল মূলত নগর রাষ্ট্রের সাথে পরিচিত ছিলেন। তাই আধুনিক সরকারের ধারণা তার শ্রেণীবিভাগে প্রতিফলিত হয়নি। তার সরকারের শ্রেণীবিভাগ ছিল রাষ্ট্রেরই শ্রেণীবিভাগ। তিনি গণতন্ত্রকে বিকৃত সরকার বলে উল্লেখ

করেছেন। কিন্তু বর্তমানকালে গণতান্ত্রিক সরকার হচ্ছে আধুনিক চিন্তাধারার বিকাশে অনুপ্রেরণার উৎসস্থল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সরকারের আধুনিক শ্রেণীবিভাগ

আধুনিককালে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। তাদের মধ্যে ব্লুন্টসলি, ম্যাকাইভার, ম্যারিয়ট ও লিককের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সরকারের আধুনিক শ্রেণীবিভাগে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন স্টিফেন লিকক। লিককের শ্রেণীবিভাগকে সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট যুক্তিসংগত এবং আধুনিক শ্রেণীবিভাগ বলে গণ্য করা যায়। আমরা এখন লিককের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রথমত: স্বার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান এবং এর প্রয়োগবিধির উপর ভিত্তি করে সরকারকে তিনি দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা-১. গণতন্ত্র, ২. স্বৈরতন্ত্র। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা যখন জনসাধারণের উপর ন্যস্ত থাকে এবং জনগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে তখন তাকে গণতন্ত্র বলে। অন্যদিকে রাষ্ট্রের ক্ষমতা যখন এক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে এবং তা নিজের ইচ্ছেমত প্রয়োগ করে তখন তাকে স্বৈরতন্ত্র বলে।

দ্বিতীয়: রাষ্ট্র প্রধানের ক্ষমতালাভের নীতি ও পদ্ধতির ভিত্তিতে তিনি গণতান্ত্রিক সরকারকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন-১. নিয়মতান্ত্রিক সরকার, ২. প্রজাতান্ত্রিক সরকার। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজা রাষ্ট্রপ্রধান হলেও প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে। যুক্তরাজ্যের শাসন ব্যবস্থা-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অন্যদিকে রাষ্ট্রপ্রধান যখন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন তাকে প্রজাতান্ত্রিক সরকার বলে। যেমন- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার।

তৃতীয়ত: আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে তিনি গণন্ত্রকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার এ দু'ভাগে ভাগ করেছেন। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ আইন সভার নিকট দায়ী থাকে। একটি মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয। যেমন বাংলাদেশ, ভারত ও ব্রিটেনে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিকট দায়ী নয়। এখানে শাসনভার ন্যস্ত থাকে রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্টের উপর। মন্ত্রিপরিষদ তাদের কাজকর্মের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকেন। রাষ্ট্রপতি আইন সভার নিকট দায়ী নন। যেমন-যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।

চতুর্থত: কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকারকে তিনি দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা-এক কেন্দ্রীক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার। সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা যখন কেন্দ্রের উপর ন্যস্ত হয় তখন সে সরকারকে এক কেন্দ্রিক সরকার বলা হয়। যেমন বাংলাদেশ সরকার। আবার সংবিধান অনুযায়ী যখন কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করা হয় তখন তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলা হয়। যেমন-আমেরিকার ও কানাডার যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার।

স্বৈরতন্ত্রকে কর্তৃপক্ষের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে তিনি সরকারকে তিনভাবে বিভক্ত করেছেন। যথা-১. নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, ২. একনায়কতন্ত্র, ৩. সামরিক কতিপয়তন্ত্র। কর্তৃত্বের প্রকৃতি ও ব্যাপকতার ভিত্তিতে স্বৈরতন্ত্রকে আবার কর্তৃত্ববাদী ও সর্বাত্মকবাদী এ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। আধুনিকতা প্রবণ কর্তৃত্ববাদী সরকার আবার সামরিক ও বেসামরিক এই দু'ধরনের হতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্টিফেন লিকক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে এভাবে সরকারের শ্রেণীবিভাগ উপস্থাপন করেছেন।

সারকথা: প্রাচীনকালে যারা সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন তাদের মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগটি গুরুত্বের দাবীদার। তিনি সংখ্যা ও নীতির উপর ভিত্তি করে সরকারের শ্রেণী বিভাগ করেছেন। বর্তমান যুগে সরকারের রূপ ও প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিককালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্টিফেনের যৌক্তিক ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সরকারের তাৎপর্যমন্ডিত শ্রেণীবিভাগ করেছেন। তিনি শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের সম্পর্ক, কেন্দ্র ও প্রদেশের ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে সরকারের বাস্তবসম্মত শ্রেণীবিন্যাস করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. দু'টি মূলনীতির উপর সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন কে ?

ক. সক্রেটিস

খ. পে- টো

গ. এরিস্টটল

ঘ. হেরোডোটাস।

২. এরিস্টটলের মতে উত্তম সরকার কোনটি ?

ক. গণতন্ত্র

খ. রাজতন্ত্র

গ. অভিজাতন্ত্র

ঘ. পলিটি।

৩. সরকারের সর্বাধুনিক শ্রেণীবিভাগ করেছেন কে ?

ক. রুশো

খ. গার্নার

গ. মন্টেস্কু

ঘ. লিকক।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১. এরিস্টটল কোন ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. এরিস্টটলের সরকারের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।

২. আধুনিক সরকারের শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করুন।

উত্তারমালাঃ ১. গ, ২. ঘ. ৩. ঘ ।

সহায়ক গ্রন্থ

ড. এমাজউদ্দীন আহমদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা।

প্রফেসর ইউনুস আলী দেওয়ান, পৌরবিজ্ঞান পরিচিতি।

পাঠ-৪

জাতীয় সংহতি
(National Integration)

উদ্দেশ্য:

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জাতীয় সংহতি কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জাতীয় সংহতির সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

জাতীয় সংহতি কি?

আধুনিকীকরণ ও রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জাতীয় সংহতি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। অধ্যাপক এলমন্ড রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কতকগুলো সংকটের কথা উল্লেখ করেছেন, জাতীয় সংহতির সমস্যা তার মধ্যে অন্যতম। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের সম্মুখীন। তাদের মূল সমস্যা হচ্ছে জাতীয় সংহতির সমস্যা। এর ফলে উন্নয়নের গতি ব্যাহত হচ্ছে। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত অনেক দেশই উপলব্ধি করেছে যে, স্বাধীনতা লাভ করার চেয়ে জাতি গঠন আরও কঠিন কাজ। একটি সংজ্ঞা দ্বারা জাতীয় সংহতি বর্ণনা করা যায় না। জাতীয় সংহতি কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়।

স্বাধীনতা লাভ করার চেয়েও জাতি গঠন আরও কঠিন কাজ

জাতীয় সংহতি বা ঐক্যসাধন হচ্ছে এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে পৃথক কতকগুলো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে একটি ভূখন্ডগত আওতাধীনে নিয়ে এসে জাতীয় একাত্মতা প্রতিষ্ঠা করা হয়। সংহতি হল সরকারের সেই ক্ষমতা যার মাধ্যমে সেই রাষ্ট্রের ভেতর সমস্ত সংগঠনের উপর নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব খাটাতে পারে। এবং এই ক্ষমতাবলে জনগণের আঞ্চলিক ও সংকীর্ণ দৃষ্টি ভঙ্গি দূর করে জাতীয় চেতনার সৃষ্টি করে। প্রফেসর রওনক জাহান অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, জাতীয় সংহতি হল সেই প্রক্রিয়া যার দ্বারা এমন একটি জাতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয় যা সকল আঞ্চলিক ব্যবস্থাকে অধীন বা অঙ্গীভূত করে ফেলে। (National integration in broadly defined terms refer to the process by which a national political system is created which supersedes or incorporates all the regional subsystem) একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পর্কযুক্ত জনগোষ্ঠী যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় তখন আমরা তাকে জাতীয় সংহতি বলে চিহ্নিত করতে পারি।

কোন ব্যবস্থাকে একতাবদ্ধ রাখার সাধারণ সমস্যা বুঝাতে সংহতি কথাটি ব্যবহৃত হয়। এর সঙ্গে বিশেষণ যোগ করে বলা হয় জাতীয় সংহতি, ভৌগোলিক সংহতি, আচরণগত, মূল্যবোধগত সংহতি, রাজনৈতিক সংহতি ইত্যাদি। আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে জাতীয় সংহতি।

উপরি উক্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে সংহতি বলতে যা বুঝায় তা হলো:

১. সংহতি বলতে জাতীয় একাত্মতা প্রতিষ্ঠাকরণকে বুঝায়।
২. এটা অধীনস্ত রাজনৈতিক ইউনিট বা অঞ্চলগুলোর উপর জাতীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।
৩. সংহতি বলতে শাসক শাসিতের যোগসূত্র স্থাপন করার সমস্যার কথা বুঝানো হয়।
৪. কখনও এটা মূল্যবোধগত ন্যূনতম মতৈক্যকে বুঝানো হয় যা সামাজিক শৃঙ্খলা ও গতিশীলতার জন্যে প্রয়োজন।
৫. সংহতি কথাটি মানবিক সম্পর্ক ও মনোভাবের বিরাট ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে।

উন্নয়নশীল জাতিগুলো সম্পর্কে একটি কথা গুরুত্বের সঙ্গে বলা হয়ে থাকে যে তাদের মূল সমস্যা হচ্ছে জাতীয় সংহতি অর্জন করা যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এডওয়ার্ড শীলস ও এল বাইন্ডার উল্লেখ করেন যে, রাজনৈতিক উন্নয়ন ও জাতীয় সংহতি হচ্ছে যুগপৎ সংযুক্ত বিষয়। জাতীয় সংহতির দিকে যে কোন পদক্ষেপ রাজনৈতিক উন্নয়নের সূচক।

জাতীয় সংহতি হচ্ছে এলিট ও জনগণের মধ্যকার ভৌগোলিক মূল্যবোধগত সংহতিমূলক আচরণ। জাতীয় সংহতি মূলত ভূখন্ডগত ও জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি সমস্যার প্রতি ইংগিত প্রদান করে; যা সংকীর্ণ আনুগত্যকে দূরীভূত করবে অথবা অধীনস্ড় করে নেবে। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নানা উপজাতি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় থাকতে পারে। তাদের মধ্যে সংকীর্ণ আদর্শ দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত থাকা স্বাভাবিক। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা এবং পূর্ণ কার্যকারিতার জন্য এ সমস্ড় দ্বন্দ্বের অবসান হওয়া অবশ্য কাম্য। এ সকল উপজাতি গোষ্ঠীকে একটি জাতীয় সম্প্রদায়ের অন্ড়র্ভুক্ত করার প্রক্রিয়ার নামই হচ্ছে জাতীয় সংহতি।

নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলোতে জনসাধারণ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ না করায় সেখানে জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তা উচ্চতর মাত্রায় দেখা দিয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো নানা ধরনের সংহতিগত সমস্যার সম্মুখীন। সরকারের ব্যাপক কার্যক্রম সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা-সংহতিগত সমস্যার সৃষ্টি করে। রাষ্ট্র যখন সম্পদ কাজে লাগানো এবং বন্টন করার ব্যাপারে সক্রিয় হয় তখন সাধারণ মানুষ ও এলিটের মধ্যে নতুন ধরনের সংহতির প্রয়োজন দেখা দেয়।

জাতীয় সংহতি সাধনের ক্ষেত্রে রয়েছে বহুবিধ সমস্যা । আমরা এখানে গোষ্ঠীগত ও সম্প্রদায়গত পার্থক্য, শিক্ষার অভাব ও নেতৃত্বের সংকট ও এই চারটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব।

গোষ্ঠীগত ও সম্প্রদায়গত পার্থক্য

নতুন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও ঐতিহ্যের দিক থেকে পার্থক্য দেখা যায়। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনতা লাভ করলেও গোষ্ঠীগত পার্থক্য বিভিন্ন ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। ফলে জাতীয় ঐক্য মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়। আঞ্চলিক ও সম্প্রদায়িকতার বিষবাস্প জাতীয় সংহতির প্রতি চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেয়। একাত্মতার সংকটের ফলে সরকারকে নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

শিক্ষার অভাব

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে শিক্ষার হার খুবই কম। এ সকল দেশের সমাজব্যবস্থা বিভিন্ন কুসংস্কারে জর্জরিত। শিক্ষার অভাবে তারা তাদের নাগরিকতাবোধ ও জাতীয় চেতনাবোধ সম্বন্ধে যথেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করতে পারে না। অশিক্ষার কারণেই পশ্চাৎপদ সমাজ ব্যবস্থায় সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, ক্ষমতার মোহ, অর্থের লোভ, ব্যক্তিস্বার্থ, উগ্র ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা বিরাজ করে। উদার চেতনাবোধের অভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সহঅবস্থান অনেক সময়েই সম্ভবপর হয়ে উঠে না। অশিক্ষা নাগরিকদের মধ্যে সংকীর্ণতা ও ক্ষুদ্র মানসিকতার জন্ম দেয়। এর ফলে জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ চিন্ড়া-চেতনা প্রায়শই ধারণ করতে পারে না। তাই নি:সন্দেহে একথা বলা যায় যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষার অভাব সংহতির পথে একটি বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে।

> অশিক্ষা নাগরিকদের মধ্যে সংকীর্ণতা ও ক্ষুদ্র মানসিকতার জন্ম দেয়

নেতৃত্বের অভাব

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো যে সমস্ত গুণাবলীর মাধ্যমে সংহতি লাভ করতে পারে নেতৃত্ব তার মধ্যে অন্যতম। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্যে প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্বের। জাতি গঠনে নেতৃত্বের ভূমিকা অপরিসীম। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দায়িত্বহীন আচরণের কারণে জাতীয় সংহতি সাধন বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিত্ব ও আদর্শের মধ্যে সৃজনশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। আর এ কারণেই এলিট ও জনগণের মধ্যে সুষ্ঠু যোগাযোগ ও সমঝোতা গড়ে ওঠেনি। সংহতির জন্যে প্রয়োজন ভারসাম্য পূর্ণ আঞ্চলিক উন্নয়ন। সুযোগ্য নেতৃত্ব ব্যতীত একটি দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন অসম্ভব ব্যাপার। উন্নয়নশীল দেশের নেতৃবৃন্দ বিচক্ষণতার সাথে দেশ পরিচালনা করতে সক্ষম হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও জাতীয় সংহিত অর্জন সহজ হবে।

জাতীয় সংহতির জন্যে প্রয়োজন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সুষ্ঠু বিকাশ

সামাজিক ন্যায় বিচার, সাম্য, আইনের শাসন নৈতিকতা প্রভৃতি মূলবোধ ও আদর্শ জাতীয় সংহতির জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।উন্নয়নশীল দেশের নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে এ সকল আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। এ ব্যর্থতা ও বিপর্যয় জাতীয় সংহতির পক্ষে বাঁধা স্বরূপ। জাতীয় সংহতির জন্যে প্রয়োজন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সুষ্ঠু বিকাশ। লক্ষ্যণীয় যে, ১৯৫৮ সাল থেকে পাকিস্তানে এবং ১৯৭৫ সাল থেকে বাংলাদেশে বেশ কয়েকবার সামরিক হস্তক্ষেপের কারণে এসকল দেশে রাজনৈতিক সংগঠন ও জাতীয় সংহতির পথ সুগম হয়ে ওঠতে পারেনি।

সামরিক বাহিনীঃ

এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ এবং ক্ষমতা দখলের প্রবণতা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলের ফলে বহুদলীয় শাসনব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে এবং একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষমতা দখলের ফলে গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়। সামরিক হস্তক্ষেপের কারণে বাকস্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় এবং অবধারিতভাবে পতন ঘটে গণতন্ত্রের। দেখা দেয় সাংবিধানিক সংকট এবং বৃদ্ধি পায় প্রশাসনিক জটিলতা। সামরিক শাসন বিনষ্ট করে অর্থনৈতিক ভারসাম্য। এর ফলে ক্ষুণ্ন হয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার। সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ এভাবে উন্নয়নশীল দেশে জাতীয় সংহতির অন্তরায় সৃষ্টি করে।

সারকথাঃ

বিশ্বের উন্নয়নশীল জাতিগুলো জাতীয় সংহতির সমস্যায় নিমজ্জিত। জাতীয় সংহতি সরকারের সেই ক্ষমতাকে বুঝায় যার সাহায্যে রাষ্ট্রের যাবতীয় সংগঠনের উপর কর্তৃত্ব চালাতে পারে। সংহতি সমস্ত আঞ্চলিক ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী দূরীভূত করে জাতীয় চেতনার বিকাশ সাধন করে। সকল উপজাতী গোষ্ঠীকে একটি জাতীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করার নাম জাতীয় সংহতি। গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক কৃষ্টির সুষ্ঠু বিকাশ এবং বিচক্ষণ নেতৃত্ব জাতীয় সংহতি লাভের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ
সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় সংহতির কথা কে বলেছেন?
ক. এডওয়ার্ড শীলস
খ. বাইন্ডার
গ. এলমন্ড
ঘ. কোলম্যান।

২. স্বাধীনতার লাভ করার চেয়ে কঠিন কাজ কোনটি ?
ক. দেশের উন্নয়ন
খ. জাতি গঠন
গ. ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ
ঘ. প্রশাসনিক উন্নয়ন।

৩. জাতীয় সংহতির জন্য কি প্রয়োজন?
ক. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সুষ্ঠু বিকাশ
খ. রাজনৈতিক দল গঠন
গ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন
ঘ. সুষম বন্টন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ
১. জাতীয় সংহতি বলতে কি বুঝায়?

রচনামূলক প্রশ্নঃ
১. জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যাবলী আলোচনা করুন।

উত্তরমালাঃ ১. গ, ২. খ, ৩. ক।

পাঠ-৫

বিপ্লব ও সংস্কার

Revolution and Reformation

উদ্দেশ্য:

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সংস্কারের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- বিপ্লব ও সংস্কারের মধ্যে তুলনা করতে পারবেন।

বিপ্লব

বিপ্লব ও সংস্কারের মধ্যদিয়ে বিশ্বের ইতিহাসের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সাধারণভাবে বিপ্লব বলতে সহিংস পথে একদল কর্তৃক অপরদল শাসকের পরিবর্তন বুঝায়। সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা, দার্শনিক কার্লমার্কস বিপ্লবকে ইতিহাসের নিয়ন্ত্রা হিসেবে অভিহিত করেছেন। সমাজবিজ্ঞানী এঙ্গেলস উল্লেখ করেন, বিপ্লব হল এমন একটা হাতিয়ার যার সাহায্যে সামাজিক আন্দোলন পুরনো রাজনৈতিক ধ্যান ধারণাগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। লেনিন বিপ্লবকে শোষিত আর নিপীড়িতদের মহোৎসব বলে উল্লেখ করেছেন। লেনিনের কথায় পুরনো সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার অর্থ হচ্ছে বিপ্লব। মাওসেতুং এর ভাষায় -বুর্জোয়া সমাজ কাঠামো উচ্ছেদ করে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার নাম হচ্ছে বিপ্লব। মার্কসবাদীদের মতে, বিপ্লব বলতে বল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং ও শাসকশ্রেণীর উৎখাত এবং আর্থ সামাজিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তনকে বুঝায়। মাকর্সীদের মতে উৎপাদন সম্পর্ক ও বন্টন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনই হল বিপ্লব। আসল কথা হলো বিপ্লব একটি প্রগতিশীল নতুন সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণ ঘটায়।

এস পি হান্টিংটনের মতে- বিপ্লব হচ্ছে কোন সমাজের প্রধান প্রধান মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এর সামাজিক কাঠামো, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, নেতা ও সরকারি কার্যকলাপ এবং নীতি সমূহের মৌলিক ও অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন। (A Revolution is a rapid fundamental and violent domestic change in the dominant values and myth of society, in its political institution, social Structure, leadership and Government activities and policies')

বিপ্লব হলো সামাজিক ও রাষ্ট্র কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন

মুলত বিপ্লব হলো সামাজিক ও রাষ্ট্র কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন। বিপ্লবের উল্লেখ্যযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা ১৬৮৮ সালে ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব, ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব, ১৯১৭ সালের রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, ১৯৪৯ সালে চীনের বিপ্লবের কথা আমরা বলতে পারি। হান্টিংটন উল্লেখ করেন যে, বিপ্লবকে অবশ্যই যে কোন রকম গণআন্দোলন, বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান, অথবা স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে পৃথক করে দেখতে হবে। কারণ এগুলো সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করে না। এ অর্থে বিশ্বে বিপ্লব খুব কমই সংঘটিত হয়েছে।

অতীতের বড় বড় সভ্যতা যেমন- মিশর, পারস্য, ব্যাবিলন, ভারত, চীন, গ্রীস ও রোম এগুলোর বংশগত পরিবর্তন এবং বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা থাকলেও কোনটিই বিপ্লব সাদৃশ্য নয়। প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলোতে বিভিন্ন গোত্রের উত্থান-পতন সংঘটিত হলেও তাকে বিপ্লব বলা যায় না। এ প্রসঙ্গে এ্যারেন্ট হান্না বলেন যে, যেখানে সহিংসতার ফলে একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সম্পূর্নভাবে ভিন্ন ধর্মী সরকার ব্যবস্থা গড়ে তুলে তাকে বিপ্লব বলা হয়। ব্যাপকভাবে জনগণের অংশগ্রহণ ও হস্তক্ষেপ বিপ্লবের মূল বিষয়। কোন বিপ্লব কত বড় তা বিচার করতে হবে জনসাধারণের অংশগ্রহণের তীব্রতার দ্বারা। বিপ্লব এমন কোন কিছু নয় যা কোন সমাজে যে কোন সময়ে সংঘটিত হতে পারে। বিপ্লবের জন্যে অনুকূল পরিবেশ আবশ্যক। যখন রাজনীতিতে নতুন নতুন গোষ্ঠীর অংশগ্রহণের চুড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটে, তখন বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। মানব ইতিহাসে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার দৃষ্টান্ত খুব কম।

ব্যাপকভাবে জনগণের অংশগ্রহণ ও হস্তক্ষেপ বিপ্লবের মূল বিষয়

মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিপ্লবঃ

মার্কসবাদীগণ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে বিপ্লবের ব্যাখ্যা করেছেন। সমাজের বৈষয়িক উৎপাদান প্রণালীর মধ্যেই যে দ্বন্দ্বের বীজ নিহিত তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল সমাজ বিপ্লব। সমাজের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক বিরোধের ফলে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া জটিল আকার ধারণ করে। সামাজিক বিপ্লবের মূল উৎস হল সমাজের অভ্যন্তরীণ পরস্পর বিরোধী শ্রেণীসমূহের দ্বন্দ্ব, নতুন উৎপাদিকা শক্তি ও সাবেকী উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধ। এই বিরোধ শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। কোন কোন শ্রেণী সনাতন উৎপাদন সম্পর্কে এবং তার উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু বিপ্লবী শক্তি তা ধ্বংস করার জন্যে সংগ্রাম করে। বিপ্লবী শ্রেণী পুরনো রাষ্ট্রক্ষমতার উচ্ছেদ ঘটায়, সাবেক রাজনৈতিক উপরি কাঠামো ধ্বংস করে নতুন ধরনের রাষ্ট্রক্ষমতা এবং নতুন উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে তোলে।

সকল সামাজিক দ্বন্দ্বের মূল দ্বন্দ্ব হল উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্ব। এ বিরোধের ফলে উৎপাদন প্রণালী আর এক উৎপাদন প্রণালীতে, এক সমাজ থেকে আর এক সমাজে উত্তরণ ঘটে। নতুন উৎপাদিত শক্তি ও পুরনো উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধ যখন চরমে পৌঁছায় তখন সমাজ বিপ্লবের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ প্রস্তুত হয়। নতুন উৎপাদিকা শক্তি এবং পুরনো উৎপাদন সম্পর্কের অনিবার্য বিরোধের ফলে পুরাতন সমাজ ধ্বংস হয়ে নতুন সমাজ জন্মলাভ করে। সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমেই মানব সমাজ উৎপাদন প্রণালীর নিু পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

সকল সামাজিক দ্বন্দ্বের মূল দ্বন্দ্ব হল উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্ব

রাজনীতিতে অংশগ্রহণের কোন বিস্ফোরণ না ঘটলে কোন বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে না। যে সকল সমাজে কিছু পরিমাণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং জীবন যাত্রা জটিল হয়ে পড়েছে; সে সকল সমাজে হিংসাত্মক কার্যকলাপের ন্যায় বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিপ্লবের ফলে প্রচলিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো দ্রুত ব্যাপকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। নতুন নতুন সামাজিক গোষ্ঠীগুলো রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তৎপর হয়ে উঠে এবং নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান পড়ে তোলে। পুরনো উৎপাদন সম্পর্কের বিলোপ সাধন এবং নতুন উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনই মার্কসীয় বিপ্লবের লক্ষ্য।

বৈপ্লবিক পরিস্থিতি থাকলেই বিপ্লব সংঘটিত হয় না। তার জন্য প্রয়োজন বৈপ্লবিক তত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত বৈপ্লবিক শ্রেণী, দল ও সংগঠন। বৈপ্লবিক পরিস্থিতি, বিপ্লবী শ্রেণী ও সংগঠনের ঐক্যের মাধ্যমেই বিপ্লব সফল হতে পারে। সামাজিক বিপ্লবে শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণীই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তারাই বিপ্লবের চালিকা শক্তি। বিপ্লব রক্তক্ষয়ী হিংসাত্মক বা শান্তিপূর্ণ পথে হতে পারে। তবে মাকর্সবাদীগণ বলপ্রয়োগের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে বিশ্বাসী।

একথা সত্য যে, স্বত:স্ফূর্তভাবে কখনো বিপ্লব হয় না। বিপ্লবের জন্যে প্রয়োজন চালিকা শক্তি। যে সকল গোষ্ঠী ও শ্রেণী বিপ্লব সাধন করে তারাই বিপ্লবের চালিকা শক্তি। বিপ্লবের ক্ষেত্রে বিপ্লবী চালিকা শক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। শাসকশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতার মাধ্যমে বিপ্লব প্রতিরোধের চেষ্টা করে। শাসক শ্রেণী স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রক্ষমতা পরিত্যাগ করে না। এ কারণে যে কোন বিপ্লবেই রাষ্ট্রক্ষমতার প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দেয়। বিপ্লবের মাধ্যমে স্থির হয় কোন শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে কর্তৃত্ব লাভ করবে। মার্কসীয় তত্ত্ব বিপ্লবকে সংকীর্ণ অর্থে ব্যাখ্যা করে না। মার্কসবাদীগণ বিপ্লব বলতে এমন একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে বুঝান যার মাধ্যমে পুরনো সমাজ ধ্বংস হয়, গড়ে উঠে এক নতুন সমাজ। বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধন করে। তাদের প্রধান লক্ষ্য হল শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করা।

স্বতঃস্ফূর্তভাবে কখনো বিপ্লব হয় না। বিপ্লবের জন্যে প্রয়োজন চালিক শক্তি।

সংস্কার

সমাজের বিকাশ ও অগ্রগতির স্বার্থেই প্রয়োজন দেখা দেয় সংস্কারের। সংস্কার হচ্ছে এমন এক পরিবর্তন যেখানে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রচলিত কাঠামো ঠিক রেখে প্রশাসনের কোন অংশের বা বিশেষ কোন দিকের পবির্তন পরিবর্ধন, সংযোজন বা বিয়োজনকে সংস্কার বলা হয়।

সমাজের বিকাশ ও অগ্রগতির স্বার্থেই প্রয়োজন দেখা দেয় সংস্কারের

এস পি হান্টিংটনের মতে সংস্কার বলতে এমন এক পরিবর্তনের কথা বুঝায় যেখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাম্য বিধান করা হয়। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে জনগণ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। (Reform means a change in the direction of greater social,

economic or political regulatory, a broadening of participation in the society and polity.)

মূলত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভ্যন্ড়রীণ ও বাহ্যিকভাবে ধীরগতিতে এবং সীমিত পরিমাণে পরিবর্তন সাধিত হওয়াকে সংস্কার বলে। বর্তমান বিশ্বে আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ জনকল্যাণমূলক তত্ত্বের সাহায্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সংস্কারমূলক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছে। কারণ বিপ্লব প্রতিরোধে সংস্কারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিপ্লব ও সংস্কারের তুলনা

বিপ্লব ও সংস্কারের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সাধারণভাবে বিপ্লব এবং সংস্কার দু'টি পরস্পর বিরোধী প্রক্রিয়া। সংস্কার একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। শাসকশ্রেণী সংস্কারের মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব দূরীকরণের চেষ্টা করে। সংস্কার সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন করে সমাজের স্থায়িত্ব ও সংরক্ষণের চেষ্টা করে। সমাজের সংহতি সাধন সংস্কারের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু বিপ্লব সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে। মার্কসবাদীরা মনে করে সংস্কারবাদী ব্যবস্থা সমাজে বিদ্যমান উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তনের বিরোধী সংস্কারের মাধ্যমে অসম উৎপাদন ব্যবস্থা কখনো নির্মূল হয় না। শোষক শ্রেণী সংস্কারকে লক্ষ্যপূরণের কৌশল হিসেবে প্রহণ করে। এই লক্ষ্য হলঃ ১. বৈপ্লবিক সংগ্রামের তীব্রতা হ্রাস করা, ২. জনসধারণের মধ্যে বিপ্লব বিরোধী মানসিকতা গড়ে তোলা।

সংস্কার সমাজের আংশিক পরিবর্তন নিয়ে আসে

বিপ্লব ও সংস্কারের মধ্যে পার্থক্য হল মাত্রার তারতম্য। বিপ্লবের ফলে গোটা সমাজের পরিবর্তন হয়। আর সংস্কার সমাজের আংশিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। বিপ্লব অতি অল্পসময়ে এবং দ্রুতগতিতে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন করে। অন্যদিকে সংস্কার শান্তিপূর্ণ ও ধীরগতিতে পরিবর্তন আনে। বিপ্লব একটি দেশর রাজনীতিতে কঠোরতা ও অনমনীয়তা বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে সংস্কার রাজনীতিতে নমনীয় ও উদার পরিবেশ সৃষ্টি করে। বিপ্লবীকে প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয় অপরদিকে সংস্কারক রক্ষণশীল ও বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ দুই ফ্রন্টে লড়াই করতে হয়। বিপ্লবের ফলে অনেক রক্তপাত হয়; যা সংস্কারে সাধারণত ঘটে না। আসল কথা হল সংস্কার প্রচলিত সামাজিক কাঠামোর সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে না। একমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সম্ভব।

সারকথাঃ

বিপ্লব ও সংস্কারের মধ্যে দিয়েই বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তন অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিপ্লব একটি প্রগতিশীল নতুন সমাজব্যবস্থার উত্তরণ ঘটায়। বিপ্লব প্রতি অল্পসময়ে সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে অন্যদিকে সংস্কার শান্তিপূর্ণ ও ধীরগতিতে সমাজের পরিবর্তন ঘটায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. বিপ্লবকে শোষিত আর নিপীড়িতদের মহোৎসব বলে উল্লেখ করেছেন কে?
ক. কার্লমার্কস
খ. লেনিন
গ. এঙ্গেলস
ঘ. মাওসেতুং।

২. ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল কত সালে?
ক. ১৬৮৮
খ. ১৭৮৯
গ. ১৯১৭
ঘ. ১৯৪৯।

৩. বিপ্লবকে ইতিহাসের নিয়ন্ত্রক হিসেবে উল্লেখ করেছেন কে?
ক. স্টালিন
খ. লেনিন
গ. কালমার্কস
ঘ. হোচিমিন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বিপ্লবের সংজ্ঞা দিন।
২. বিপ্লব ও সংস্কারের তুলনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. মার্কসীয় দৃষ্টিকোন থেকে বিপ্লবের ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালাঃ ১. খ, ২. খ, ৩. গ।

সহায়ক গ্রন্থঃ

১. ড. এমএ ওয়াদুদ ভূঁইয়া, সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক উন্নয়নের রূপরেখা
২. Hanna Aren't, On Revolution, Viking press 1963